বাংলার বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে আমার যোগাযোগ

ফাদার রবের আঁতোয়ান এস.জে

বাংলার বুদ্ধিজীবী জীবনের সঙ্গে আমার সম্পর্ক চার দশকেরও বেশি। এক তরুণ জেজুইট হিসেবে আমি ভারতবর্ষে আসি ১৯৩৯-এর শেষে। পূর্বজীবনে ছিলাম এক খ্রিস্টধর্মবলম্বী পরিবারে লালিত জনৈক তরুণ ইওরোপীয়, সাহিত্য শাখার ছাত্র, প্রাচীন গ্রিক ও লাতিন সাহিত্যে বিশেষ আগ্রহী, ফরাসি সাহিত্যের সঙ্গেও পরিচিত এবং মধ্যযুগের দর্শন অধ্যয়ন সহ সাত বছর ব্যাপী জেজুইট প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত।

ভারতবর্ষ ও তার সংস্কৃতি সম্বন্ধে জানতাম অতি সামান্যই। ফলে, আমার এখানকার নানাবিধ অভিজ্ঞতার মধ্যে এক অভিনবত্বের স্বাদ সঞ্চারিত হয় যা আমাকে খুবই উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করেছিল। আমার এই প্রবন্ধটির গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত একটি মধ্যযুগীয় প্রবাদ মনে রাখা ভাল ঃ 'যে যা পায় সে তার চরিত্র অনুসারেই পায়।' বাঙালি মনীষার সঙ্গে আমার দীর্ঘ সম্পর্কের বিষয়ে আমার মনোভাবকে কোনো দৃঢ় সিদ্ধান্ত হিসেবে না দেখে কেবল এক বন্ধুভাবাপন্ন জিজ্ঞাসু দর্শকের ব্যক্তিগত ধারণা হিসেবে গ্রহণ করা উচিত।

বাঙালি বুদ্ধিজীবীরা একরকম নন। বস্তুত, তাঁরা বহুজনে বহুরকম। তবু, তাঁদের সকলেরই একটি সাধারণ লক্ষণ আছে। তাঁরা সকলেই এক ঐতিহ্যের গুরুভার অনুভব করেন, যে ঐতিহ্যকে কোনো না কোনো ভাবে তাঁদের মেনে নিতেই হয়। এবং এই আবহমান ধারাবাহিকতার প্রতি তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গির বিভিন্নতার দ্বারাই তাঁদের নিজেদের মধ্যে পার্থক্যগুলি সূচিত হয়।

আমার প্রথম প্রত্যক্ষ যোগাযোগ স্থাপিত হয় যখন আমি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দিলাম সংস্কৃতে স্নাতকোত্তর শ্রেণির ছাত্র হিসেবে। আমার জেজুইট কর্তৃপক্ষ ভেবেছিলেন যে সংস্কৃত শিখলে আমার প্রাচীন সাহিত্যশিক্ষা সম্পূর্ণ হবে। সে এক অত্যন্ত কৌতূহলোদ্দীপক অভিজ্ঞতা। সেখানে আমি কখনই ঠিক স্বস্তিবোধ করতে পারিনি, এবং আমার শিক্ষকেরা ও সহপাঠীরাও কখনও কোমলভাবে কখনও কঠোরভাবে মনে করিয়ে দিতে ভুলতেন না যে, আমি অনাত্মীয়। জনৈক বৃদ্ধ পণ্ডিত পড়াতেন বেদ— তিনি তাঁর পাঠকক্ষে আমার উপস্থিতিই সহ্য করতে পারতেন না। কিছু ছাত্র অকারণেই আমার কাছে প্রমাণ করবার চেষ্টা করতেন যে, প্রাচীন ভারতবর্ষীয় সংস্কৃতির স্থান অন্য সমস্ত সংস্কৃতির উপরে। অন্য সকলের আগে

ভারতবর্ষই সব কিছু জেনে ফেলেছিল। এমন কি আধুনিক আবিষ্কারগুলিও প্রাচীন ভারতবর্ষীয় কাহিনির পুনঃপ্রচার ছাড়া কিছু নয়। একটা অদ্ভুত দ্বন্দ্বপূর্ণ মনোভাব লক্ষ্য করতাম। পাশ্চাত্যের যে কোনো কিছুর প্রতি অবজ্ঞা, অথচ পাশ্চাত্য দেশীয় কেউ ভারতবর্ষের কোনো কিছুর সম্বন্ধে প্রশংসাসূচক একটি কথা বললেই তাই নিয়ে এক গভীর গর্বের ভাব। কালিদাসের শকুন্তলা সম্বন্ধে গ্যেটের স্তুতিটি উদ্ধৃত হত ক্রমাগত। এক অনিশ্চয়তার আত্মপ্রত্যয়হীনতার আবহাওয়া আমি বেশ অনুভব করতাম ঃ সনাতন ভারতবর্ষীয় সংস্কৃতির আশ্রয়ে গিয়ে তাঁরা চাইছেন নিরাপত্তা। আমি সর্বদাই জল্পনা করেছি যে দৃষ্টিভঙ্গী পরিবর্তনের কারণ স্বরূপ কোনো বিদেশি যেখানে উপস্থিত নেই সেখানে সম্পূর্ণ নিজেদের মধ্যেও কি তাঁরা ঐ একই ভাবে আচরণ ও বাক্যালাপ করতেন? প্রসঙ্গত, আমার সহধর্মী, ভারতবর্ষীয় জেজুইটদের মধ্যেও দেখেছি একই ধরনের মনোভাব। আমার সমবয়স্ক যাঁরা, তাঁরা তাঁদের ধর্মীয় ও দার্শনিক শিক্ষা লাভ করেছেন বিদেশীয় শিক্ষকদের কাছে। তারপরে একটা সময় এল যখন তাঁদের ভারতীয়ত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠার প্রয়োজন তাঁরা বোধ করলেন, এবং প্রায়শই সেই আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রয়াসের সঙ্গে জড়িত থাকত ক্ষোভ ও আক্রমণাত্মক মনোভাব। তার ভাবার্থ এই যে, কোনো বিদেশীয়ই ভারতবর্ষীয় সংস্কৃতির যথার্থ ধর্ম গ্রহণ করতে পারেন না।

প্রাচীনপন্থার ভক্তদের যে অন্য একটি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে আমি যথেষ্ট কৌতুক অনুভব করতাম, তাকে বলা যায় 'নীতিবাক্য প্রচার স্পৃহা'। ভারতবর্ষ ও তার সংস্কৃতির এক নৈতিক দায়িত্ব রয়েছে সমগ্র বিশ্বের প্রতি, এবং সেই বাণী তারস্বরে প্রচার করলেই আধুনিক জগতের যাবতীয় অশুভের নিরসন হবে।

এই বিশেষ চিন্তাধারাটি অন্য এক রূপে দেখেছি আর একটি গোষ্ঠীর মধ্যে, যাদের বলতে পারি সমন্বয়বাদী। কিছুটা আধুনিকতার দাবি তাঁরা করতে পারেন, আধুনিক মূল্যবোধ সম্পর্কে তাঁদের সচেতনতা অনস্বীকার্য। ধর্মনিরপেক্ষ তাঁরা নন, আধ্যাত্মিকতায় তাঁদের দৃঢ় বিশ্বাস। আমার খ্রিস্টিয় ধর্মে বিশ্বাস, খ্রিস্টিয় ধর্ম প্রচারে স্বাভাবিক আগ্রহের জন্য তাঁদের সঙ্গেও এক বিশেষ আত্মীয়তা অনুভব করেছি। সকল ধর্মকে শ্রদ্ধার সঙ্গে দেখতে ও সংকীর্ণ উগ্রভাবে স্বধর্ম প্রচারের পথ পরিত্যাগ করতে শিখেছি তাঁদের থেকেই। প্রাচ্য ধর্মাবলির সঙ্গে পরিচয় থেকে আমার এই প্রত্যয় জন্মিয়েছে যে ঈশ্বরের কৃপা নানা পথে মানবহৃদয়কে স্পর্শ করে, এবং বিভিন্ন ধর্মমতগুলি ঐশ্বরিক অভিপ্রায়ের বিচিত্র উপলব্ধির মানবসুলভ প্রকাশস্বরূপ। অতএব, ভ্রাতৃত্ববোধই উচিত দৃষ্টিভঙ্গী ঃ আমরা সকলেই তীর্থযাত্রী, ভিন্ন ভিন্ন পথ চলেছি একই লক্ষ্যের উদ্দেশে। এই আলোকে-আঁধারে আমরা সকলেই পথ খুঁজছি মাত্র, এবং আমাদের বিচিত্র ঐতিহ্য ও অভিজ্ঞতাসমূহ পরম সত্যের যে ক্ষণিক রূপ উদ্‌ঘাটিত করেছে, সেগুলিকে নম্রভাবে পরস্পর বিনিময় করাই এই সহযাত্রীদের দ্ব্যর্থক রূপ। এই উপলব্ধি হওয়ার পর আমি দেখলাম আমার সমন্বয়পন্থী বন্ধুদের মধ্যে অনেকেই বেশ সূক্ষ্ম একটি উপায়ে আমাকে পাশ কাটিয়ে যেতে জানেন। উপায়টি সব চাইতে ভালোভাবে বোঝাতে পারি একটি রূপক কাহিনির মধ্য দিয়ে। এই কাহিনিটি তারা বহু সময়ে প্রয়োগ করেন এবং এটি এত সর্বজনবিদিত

যে, তা বিস্তারিতভাবে বলাও অনাবশ্যক। উপাখ্যানটি হল হাতি ও অন্ধদের। আমার মনে হয় কাহিনিটি তখনই অর্থপূর্ণ হবে যদি ধরে নিই যে, আমরা সকলেই দৃষ্টিহীন, এবং আমাদের সকলেরই সাধারণ অন্বেষা ও আমাদের আংশিক জ্ঞান বিনিময় পূর্ণতা পাবে সত্য প্রকাশের মধ্যে। আমার সমন্বয়বাদী বন্ধুরা অবশ্য, তাঁদের সমস্ত উদারতা সত্ত্বেও, বিনীত দাবি করেন যে, চরম ও পূর্ণ সত্যের হদিশ তাঁদেরই হাতে। অন্য সকলেই দৃষ্টিহীন, রাস্তা হাতড়াচ্ছেন মাত্র, তাঁরা কিন্তু সত্য দৃষ্টির অধিকারী। তাঁরা সহযাত্রী নন, তাঁরা শেষ সীমায় পৌঁছিয়ে, প্রগাঢ় করুণাভরে অপেক্ষা করছেন, শ্রান্ত অভিযাত্রীরা কখন তাঁদের ভ্রান্তি ত্যাগ করে পূর্ণ দৃষ্টিলাভ করবেন।

একদিন জনৈক ফরাসি সাংবাদিক আমার কাছে এসে বললেন, তাঁকে শহরের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রে নিয়ে যেতে। আমি তাঁকে এক সুপরিচিত প্রতিষ্ঠানে নিয়ে যেতে, প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষের সঙ্গে আমাদের আলাপ করিয়ে দেওয়া হল, তিনি জিজ্ঞাসা করলেন আমরা খ্রিস্টধর্মাবলম্বী কিনা। আমরা বললাম, 'হ্যাঁ।'— অধ্যক্ষ মহাশয় প্রত্যুত্তরে বললেন, 'তাহলে খ্রিস্ট ধর্মের যথার্থ তাৎপর্য কী সেইটি আপনাদের বলি'। আমার সঙ্গী আমার দিকে একবার তাকিয়ে তাঁর আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'আমার মনে হয় আমি এখানকার ব্যাপার বুঝে ফেলেছি।'

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে আমার দীর্ঘ সম্পর্ক ও দক্ষিণ কলকাতার সাংস্কৃতিক জীবনের সঙ্গে আমার অসংখ্য যোগাযোগের মধ্য দিয়ে বুদ্ধিজীবীদের তৃতীয় গোষ্ঠীর সংসর্গ আমি লাভ করেছি, মানবিকতাবাদী বলে তাঁদের অভিহিত করতে পারি। তাঁদের মূলগত ঈশ্বরনিরপেক্ষ অজ্ঞাবাদিত্য ও মানসিক ঔদার্যের পরিমণ্ডলে আমি পরিপূর্ণ স্বস্তি বোধ করতাম। তাঁদের সঙ্গে সম্পর্কে আমাকে কখনোই বুঝিয়ে দেওয়া হত না যে, আমি বিদেশাগত। আবহমান গতানুগতিকতার প্রতি যুক্তিহীন আনুগত্য থেকে তাঁরা নিজেদের মুক্ত করেছেন। তবুও মনীষাগত স্বাধীনতা প্রকাশে তাঁরা বহুক্ষেত্রেই অতি সাবধানী। ব্যক্তিগত জীবনে যে সামাজিক ও নৈতিক মূল্যবোধগুলি তাঁরা সমর্থন করেন তা সর্বদা তাঁদের লেখায় প্রতিফলিত হয় না। তাঁদের একটি স্বকীয় বৈশিষ্ট্য আছে: তাঁদের ভারতীয়ত্ব অকৃত্রিম কিন্তু অনুদার নয়। তাঁদের সাংস্কৃতিক আগ্রহ বহুবিস্তৃত, এবং সংস্কৃতিগত প্রশ্নের তুলনামূলক বিচারপদ্ধতি আন্তরিক স্বীকৃতি পায় তাঁদের মধ্যেই। বাংলাদেশে মনে হয় জীবনের সর্বক্ষেত্রে রাজনীতি পরিব্যাপ্ত, কিন্তু তাও তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গিকে বিকৃত করেনি, তাঁরা গোঁড়ামি থেকে অপেক্ষাকৃত মুক্তই রয়ে গিয়েছেন। তাঁরা সাংস্কৃতিক স্বাধীনতার অগ্রদূত স্বরূপ এবং কোনো রকমের রাজনীতিক মতাদর্শে আবদ্ধতা তাঁরা সর্বদা পরিহার করে চলবার চেষ্টা করেন।

চতুর্থ গোষ্ঠীটি হল কোনো না কোনো রাজনীতিক মতবাদের প্রতি আনুগত্যপরায়ণ বুদ্ধিজীবীদের। আমি রোমান ক্যাথলিক সম্প্রদায়ভুক্ত। যুক্তিনিরপেক্ষ কট্টর বিশ্বাসশীলতার জন্যে রোমান ক্যাথলিক ধর্ম বিশেষ খ্যাতিসম্পন্ন, ফলে আমার ধর্ম সংগঠনের কিছু কিছু প্রাচীনপন্থী ধারণার সঙ্গে রাজনীতিক মতবাদে অবিচল বিশ্বাসী বুদ্ধিজীবীদের মানসিকতার বেশ কিছু কৌতুকজনক সাদৃশ্য আমি দেখতে পাই। তাঁদের আনুগত্য সাধারণত বামপন্থার

প্রতি এবং যাঁরা মার্ক্সীয় জীবন-দর্শনকে গ্রহণ করতে পারেন না তাঁরা ঘৃণ্য 'বুর্জোয়া', ঠিক যেমন, যাঁরা খ্রিস্টিয় বাণীকে অস্বীকার করেন তাঁরা হলেন হতভাগ্য 'পৌত্তলিক'। অন্ধ বিশ্বাস-সম্পন্ন ব্যক্তিরা নিজেদের ওপর সচরাচর খুব গুরুত্ব আরোপ করেন, এবং অতিরিক্ত গোঁড়ামির প্রতি আসক্তি তাঁদের থাকেই; বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য তাঁদের সম্পন্ন করতে হবে, এবং মানবজাতির ভাগ্য নির্ভর করছে তাঁদের কর্তব্যকর্মের সফলতার ওপর। সুতরাং তামসিক শক্তির বিরুদ্ধে এই কঠোর সংগ্রামে তাঁরা অংশগ্রহণ করেন, মানবজাতির অপরিহার্য ত্রাতারূপে; ইতিহাস সম্বন্ধে তাঁদের ধ্যানই কেবল অভ্রান্ত। খ্রিষ্টধর্মনুসারী ধ্যান বিশ্বাসভিত্তিক বলে স্বীকৃত হলেও, মার্ক্সীয় ধ্যান বিজ্ঞানভিত্তিক বলে দাবি করা হয়। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে, খ্রিস্টধর্ম যেমন একটি বিশ্বাস, মার্ক্সীয় তত্ত্বও সেই রকম একটি বিশ্বাসমাত্র। আমি নিজে বরং পছন্দ করি সেইরকম এক স্বাস্থ্যকর অজ্ঞাবাদকে, যা প্রতিটি মহৎ ধ্যানকে মনে করে সত্যাভিমুখী এক একটি সোপান বিশেষ, চেষ্টা করে সেই প্রতিটি সোপানে মানুষের যে অভীষ্ট তার পূর্ণতর অনুধাবনে এক মূল্যবান অভিযোজন আবিষ্কার করতে, সম্পূর্ণ উত্তর লাভের কোনো আশা না করে।

শেষত, বাঙালি সাংস্কৃতিক জীবনের একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য হল ব্যক্তিপূজার প্রতি এক প্রবল প্রবণতা, রবীন্দ্রনাথের 'সহজপাঠ' সম্বন্ধে সাম্প্রতিক বিতর্কটি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। শিক্ষাতত্ত্বের দিক থেকে একটি পাঠ্যপুস্তক পরিবর্তনের প্রশ্ন অবশ্যই তোলা যায়। আমার মনে হয় যে, যে-কোনো মহাপুরুষের মতন, রবীন্দ্রনাথও সেকেলে হয়ে যেতে পারেন। রবীন্দ্রনাথের বইটির জায়গায় অন্য বই চালু করার মূলে কেবল শিক্ষাসংক্রান্ত চিন্তাই ছিল কিনা সন্দেহ। কিন্তু ঐ প্রস্তাবটির সম্বন্ধে প্রতিক্রিয়াও অবশ্যই শিক্ষাসংক্রান্ত চিন্তা প্রসূত নয়; ব্যক্তিপূজা ও রাজনীতিক সুবিধাবাদিতার সংমিশ্রণ বিশেষ। এবং সেই থেকেই এর সততা সম্বন্ধে কিছু সন্দেহের উদ্রেক হয়। রাজনীতিক কলহের উপলক্ষ্য হিসেবে কোনো মহামানবের ভাবমূর্তিকে ব্যবহার করাকে সৎ বলা যায় না কোনো ক্রমেই। আমি অনেক সময়ে ভাবি যে, অতীতের মহাপ্রাণ মানুষদের প্রতি যে উচ্ছ্বসিত ভক্তি-অর্ঘ্য দেওয়া হয় তা কি এক চিরাচরিত গতানুগতিকতারই অংশ? সাধারণ ঐকতানে যোগ না দেওয়াটা রীতি-বহির্ভূত কিন্তু এ-জাতীয় গড্ডালিকা প্রবাহ তরুণ সমাজকে চিরকাল প্রতারিত করতে পারে না। ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধার কোনো যথাযথ মূল্য তখনই থাকে যখন তা অবান্তরতা-প্রাপ্ত অতীত নিয়ে ভাবালু রোমন্থনের চাইতে বেশি কিছু। আমাদের একান্ত আবশ্যক বিশুদ্ধতার প্রতি গভীর নিষ্ঠা। বুদ্ধিজীবীদের দায়িত্ব অতি বিরাট; তাঁদের কর্তব্য মানুষের এমন এক ভাবমূর্তি রচনা করা, যা বিভিন্ন মতবাদের মধ্যে প্রাচীরগুলিকে ভেঙে ফেলবে। রাজনীতিক দলাদলি ও সুবিধাবাদিতার বর্তমান আবহাওয়ায় শাশ্বত কোনো কিছুই কখনও সম্পন্ন হবে না। রাজনীতিক বিশ্বাস, আর্থনীতিক পরিকল্পনা, সমাজ সংস্কার, তাদের প্রকৃত লক্ষ্যে কখনই পৌঁছতে পারবে না, যতদিন অবধি মানুষের যথার্থ ভাবমূর্তি আমাদের সকলের সাধারণ অভিযাত্রার মধ্য দিয়ে পরিস্ফুট না হচ্ছে।

[বাংলা তর্জমা: মিহির সিংহ, 'সমতট'-এর সৌজন্যে]